ইসলামের দৃষ্টিতে ৯/১১

আল্লামা হামুদ বিন উক্কলা আশ-শুয়াইবি রহঃ

আল-ফজর

সেপ্টেম্বর ১১ হামলার ব্যাপারে স্পষ্ট বার্তা

সূচীপত্র

প্রশ্ন

উত্তর

প্রথম ভুল ধারণাঃ [চুক্তি]

দ্বিতীয় ভুল ধারণাঃ [নিরীহ জনগণ]

প্রথম শর্তঃ [জনসাধারণদের মধ্যে পার্থক্যকরণের অক্ষমতা]

দ্বিতীয় শর্তঃ [সমর্থক ও সহযোদ্ধা]

তৃতীয় শর্তঃ [তাদের মাঝে বিদ্যমান মুসলিম]

[উপসংহার]

[পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি]

[আল্লামা হামুদ বিন উক্বলা আশ-শুয়াইবি রহঃ'র পরিচয়]

প্রশ্নকারীঃ *আমেরিকায় ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ নিয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনা হচ্ছে। এখন একদিকে তারা আছে যারা একে সমর্থন করছে আর এর জন্য দুআ করছে আর অপরদিকে তারা যারা এর নিন্দা করছে।*

সুতরাং আপনার মতে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির কোনটি সঠিক?

উত্তরঃ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সকল সৃষ্টিকুলের মালিক, আর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক নবীজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তার বিশ্বস্ত সহযোগী, তার পরিবার, তার সাহাবী এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত হকের পথে থাকা সকল ব্যক্তিবর্গের উপর

আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলছি,

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে কুফফার আমেরিকার পক্ষ থেকে যখন কোন সিদ্ধান্ত আসে, বিশেষত সামরিক যুদ্ধের সিদ্ধান্ত, তা আইন প্রণয়নকারীদের সাধারণ মতামত বা গণভোট পর্যালোচনার পরই আসে।

আর এগুলো ঠিক জনসাধারণের মতামতেরই প্রতিফলন, যা তাদের নির্বাচিত পার্লামেন্টের সদস্যদের মাধ্যমে বোঝা যায়।

আর এজন্যে যেকোনো আমেরিকান যে সামরিক আক্রমণের পক্ষে রায় দিয়েছে সে মু'হাররিব।[১] আর নুন্যতম হলেও, সে একজন সমর্থক ও সাহায্যকারী হিসেবেই বিবেচিত হবে যা সামনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

আর এটাও জেনে রাখা উচিৎ যে মুসলিম ও কুফফার দের মাঝে চুক্তি হবে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর ভিত্তিতে, রাজনীতি বা ব্যক্তিগত সুবিধার ভিত্তিতে নয়। আর এই ইস্যুটি পবিত্র আল কোরআনে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে।

আর এই বিষয়টির ব্যাপক গুরুত্ব ও ভুল বুঝার ভয়াবহ আশঙ্কা থাকার কারনে কোরআনে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং আমরা যদি এই মহাগ্রন্থটির দিকে তাকাই, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবেই দেখব যে এই ইস্যুতে সন্দেহ বা ভুল বুঝাবুঝির কোন অবকাশ নেই।

আর এ বিষয় সংক্রান্ত অনেক আয়াত আছে যেগুলো মূলত দুটো বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। আর তা হল আল-ওয়ালা' এবং আল-বারা'। আর এ থেকে বোঝা যায় যে আল-ওয়ালা' ও আল-বারা' হল ইসলামী শরীয়াহর খুঁটিগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর এই উম্মাহর অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ের উলামাগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছেন।

---

[১] মু'হাররিব (যোদ্ধা): এমন কেউ যার সাথে মুসলিমদের কোন নিরাপত্তা চুক্তি নেই, অতএব তার রক্ত ও সম্পদ হালাল।

মহান আল্লাহ্‌ তা’ আলা কুফফারদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদের আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করা আর তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করার ব্যাপারে বলেছেন,

> *“হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।” [আল মায়িদাহঃ ৫১]*

তিনি আরও বলেন,

> *“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে (অর্থাৎ কাফির, মুশরিক ইত্যাদি) বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না….” [আল মুমতাহিনাঃ ১]*

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন,

> *“হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা সর্বনাশ করতে সামান্য ক্রুটিও করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে।*
>
> *আর তাদের অন্তরসমূহে যা গোপন করে তা আরো ভয়ানক। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে।”*
>
> *[আলে ইমরানঃ ১১৮]*

আর মহান আল্লাহ্‌ তা’ আলা কুফফারদের ত্যাগ করার আর তাদের ঘৃণা করার ব্যাপারে বলেন,

> *“তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না।*
>
> *তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।”[আল মুমতাহিনাঃ ৪]*

তিনি আরও বলেন,

> *“যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়” [সুরা মুজাদালাহঃ ২২]*

মহান রব আরও বলেন,

> *“যখন ইব্রাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন।” [আয যুখরুফঃ ২৬-২৭]*

তিনি আরও বলেছেন,

> *“বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক (আল্লাহ্‌র অবাধ্য) সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।” [আত তাওবাহঃ ২৪]*

এই আয়াতগুলো এবং আরও অনেক আয়াত এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল পেশ করে যে আমাদের কাফিরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে, তাদের ঘৃণা করতে হবে আর তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না, এবং আমি মনে করি না যে দ্বীনের ব্যাপারে সামান্যতম হলেও ইলম রাখা কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকবে।

আর এ বিষয়টি যদি সুস্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে জেনে রাখুন আমেরিকা একটি কাফির রাষ্ট্র, ইসলামের ও মুসলিমদের অনেক বড় শত্রু।

আর আমেরিকা বর্তমানে ঔদ্ধত্যের সীমা অতিক্রম করেছে এবং অসংখ্য মুসলিমদের আক্রমণ করেছে, সুদান, ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, লিবিয়া এবং অন্যান্য জায়গায় মুসলিমদের হত্যা করছে, ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটেন, রাশিয়া এবং অন্যান্য কুফরি শক্তিগুলোর সকল কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করছে।

যেভাবে আমেরিকা ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করে সেখানে বানর ও শুকরের বংশধরদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) প্রতিষ্ঠিত করেছে আর অনধিকার প্রবেশকারী ইহুদীদের অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সবরকম সাহায্য করছে- কিভাবে এতকিছু করার পরও আমেরিকা ইসলামের ও মুসলিমদের শত্রু ও আক্রমণকারী বলে গণ্য হবে না?

যাই হোক, যখন আমেরিকা বিদ্রোহ করল, সীমা অতিক্রম করল আর অহংকারী হয়ে উঠল আর দেখল যে আফগান মুসলিমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন কে ধ্বংস করে দিয়েছে, তারা ধরে নিল যে তারাই এখন একমাত্র পরাশক্তি, তাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই।

তারা ভুলে গেল যে মহান আল্লাহ্‌ তা’আলা তাদের চেয়েও অনেক শক্তিশালী আর তিনি তাদের লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও ধ্বংস করতে সক্ষম।

আর নিশ্চয়ই যা আমাদের দুঃখ দেয় তা হল এই যে আমাদের উলামাদের অনেকের অন্তর থেকেই রহমত ও আবেগ উঠে গিয়েছে, আর তারা ভুলে গিয়েছে বা তাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই কাফির রাষ্ট্রটি মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ আর কি কি অপকর্ম করছে। আর এসব করতে গিয়ে তারা করুণা বা দয়া-মায়া কিছুই দেখাইনি।

আর আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার দায়িত্ব সেসব ভুল ধারনাগুলো সংশোধন করে দেওয়া, যেগুলো আমাদের অনেক আলিম ভাইরা পোষণ করেন আর এর ভিত্তিতে নিজেদের অবস্থানের পক্ষে সাফাই গান।

১ম ভুল ধারণাঃ [চুক্তি]

তাদের অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে আমাদের ও আমেরিকার মাঝে চুক্তি আছে আর আমাদের জন্য এ চুক্তি মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আর এ ব্যাপারে আমি দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিচ্ছিঃ

প্রথমতঃ বক্তা বেশ দ্রুতই এসব কর্মকাণ্ডের জন্য মুসলিমদের দোষী সাব্যস্ত করে ফেললেন, অথচ এটা এখনও শরীয়াহ দ্বারা প্রমাণিত নয় যে মুসলিমরা এসব ঘটনার জন্যে দায়ী কিনা বা তারা এতে সাহায্য করেছে কিনা, যাতে করে তিনি বলতে পারেন যে মুসলিমরা চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

সুতরাং এখনও যেহেতু এটা প্রমাণিত নয় যে আমরা মুসলিমরা এসব বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি বা এতে অংশগ্রহণ করেছি, তাহলে কিভাবে আমরা চুক্তি ভঙ্গ করলাম?

আর কুফফারদের সাথে শত্রুতা পোষণের, তাদের ঘৃণা করার, তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে আমাদের ঘোষণার অর্থ চুক্তি ভঙ্গ করা নয়। বরং এটা শুধু আল্লাহ্ প্রদত্ত এক ফরজ দায়িত্ব যার কথা আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আর যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে মুসলিমদের সাথে আমেরিকার চুক্তি আছে, তাহলে আমেরিকা কেন সে চুক্তিগুলো মেনে চলছে না আর মুসলিম ভূমিগুলোতে আক্রমণ করে মুসলিমদের ক্ষতি করা বন্ধ করছে না।

কারণ সবাই জানে যে, চুক্তি করার অর্থ হল উভয় পক্ষ চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলবে। আর যদি তারা না মেনে চলে তাহলে তাদের চুক্তি বাতিল। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> "আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে।" [আত তাওবাহঃ ১২]

২য় ভুল ধারণাঃ [নিরীহ জনগণ]

তারা বলে যে মৃতদের মধ্যে কিছু মানুষ ছিল যারা ছিল ভাল ব্যক্তি ও নির্দোষ। আর এর উত্তর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া যায়ঃ

প্রথমতঃ আস সা'ব ইবনে জুছামাহ (রদিয়াল্লাহু তা' আলা আনহু) রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মুশরিকদের ঘরের লোকজন সম্বন্ধে, যদি তাদের রাতের অন্ধকারে আঘাত করা হয় আর তাদের নারী ও শিশুরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

তিনি ﷺ বলেছেন, *"তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"*

[আল বুখারী, মুসলিম, ইবন মাঝাহ, আত তিরমিজি এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত]

দ্বিতীয়তঃ মুসলিমদের নেতারা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কামানের গোলা দিয়ে আক্রমণ করতেন। আর আমরা সবাই জানি যে যখন কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হয় তখন এটা দেখে না যে কে যোদ্ধা আর কে যোদ্ধা নয়।

আর এটি এমন কাউকে গিয়ে আঘাত করতে পারে যাকে হয়ত তারা নিরীহ বলবে। কিন্তু তারপরও, মুসলিমরা যুদ্ধে এই সুন্নাহটি অব্যাহত রেখেছিল।

ইবন কুদামাহ (আল্লাহ্ তাকে রহম করুন) বলেন,

> "কামানের গোলা নিক্ষেপ করা জায়েয কারণ রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তায়িফের লোকজনের বিরুদ্ধে কামান ব্যবহার করেছিলেন আর আমর ইবনুল আস, ইস্কান্দারিয়াহর লোকজনের উপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করেছিলেন।"
>
> [আল-মুঘনি ওয়াশ-শারহ, ১০ম খণ্ড/৫০৩]

এবং ইবনে কাসিম (আল্লাহ্ তাকে রহম করুন) নিজের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন,

> "কাফিরদের উপর কামান দিয়ে আক্রমণ করা জায়েয, যদি এর দরুন অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও বুজুর্গ দরবেশরা মারা পড়ে, কারণ তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে উম্মাহর ইজমা রয়েছে।
>
> ইবন রুশদ, (আল্লাহ্ তাকে রহম করুন) বলেন, 'সকল প্রকারের কাফিরদের ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখার জন্য ভয় দেখান ইজমা দ্বারা জায়েয।"
>
> [আল-হাশিয়াহ 'আলা আর-রাওধ, ৪র্থ খণ্ড/২৭০]

তৃতীয়তঃ ইসলামের ফকীহগণ সেসব মুসলিমদের হত্যা করা বৈধ বলেছেন যাদের কুফফাররা ঢালস্বরূপ ব্যবহার করছে; যদি তারা কুফফারদের হাতে বন্দি হয় আর কুফফাররা মুসলিম তীরন্দাজদের মোকাবিলা করার সময় তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে।

যদিও সেসব মুসলিমদের কেবল ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে আর তারা নিরীহ, ঐ আলেমদের মতে তারাও 'নিরীহ জনগণ' আর তাদের মত অনুযায়ী তাদেরকে হত্যা করা যাবে না।

ইবন তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ্ তাকে রহম করুন) বলেছে,

> "এ ব্যাপারে উলামা একমত হয়েছেন যে, যদি কুফফাররা মুসলিম বন্দিদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আর এই ভয় থাকে যে লড়াই না করলে মুসলিমদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, এমতাবস্থায়ও মুসলিমদের উচিৎ লড়াই চালিয়ে যাওয়া, যদিও এর ফলস্বরূপ মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত মুসলিমদের মারা পড়তে হবে।"
>
> [আল ফাতাওয়া, ২৮ তম খণ্ড/৫৩৭ ও ২০ তম খণ্ড/৫২]

আর ইবন কাসিম (আল্লাহ্ তাকে রহম করুন) আল হাশিয়াহতে ও আল ইনসাফ এ বলেছেনঃ

> "যদি তারা মুসলিমদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে তাদের উপর আক্রমণ করা জায়েয হবে না যদি না (সমগ্র) মুসলিমদের ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে। (এক্ষেত্রে) তার উচিৎ তাদের আক্রমণ করা শুধুমাত্র কুফফারদের আঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে, আর এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।"
>
> [আল-হাশিয়াহ 'আলা আর-রাওধ, ৪র্থ খণ্ড/২৭১]

আর যে ভাইরা আমেরিকায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটিকে 'সন্ত্রাসবাদ' নাম দিচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্য করে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। প্রশ্নটি হলঃ

আমেরিকার যুদ্ধবিমান ও মিসাইল গুলো যখন সুদানের ঔষধ কারখানাটি মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল[২], ধ্বংস করে দিয়েছিল,এবং সেখানে অবস্থানরত মুসলিম কর্মীদের হত্যা করেছিল সেটা কি ছিল? যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে সংঘটিত কর্মকাণ্ড গুলো যদি সন্ত্রাসবাদ হয় তাহলে কি আমেরিকার এই কাজটি সন্ত্রাসবাদ হিসেবে বিবেচিত হবে না?

আর কেন তারা আমেরিকার এই ঘটনাটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে ও নিন্দা জ্ঞাপন করছে যখন আমরা তাদের একজনকেও সুদানের ফ্যাক্টরিতে আমেরিকার বোমা হামলা ও সেখানকার লোকজনকে হত্যা করা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে বা নিন্দা জ্ঞাপন করতে দেখিনি?

---

[২] ২০ আগস্ট, ১৯৯৮ তে সুদানের খারতৌমে অবস্থিত 'আল শিফা ঔষধ কারখানা' তে আমেরিকার মিসাইল হামলা নিয়ে বলা হচ্ছে, যেখানে সমগ্র ভবনটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল ও অনেক মানুষ নিহত হয়েছিল। এই কারখানাটি অ্যান্টিবায়োটিক ও ভ্যাক্সিন সহ সমগ্র সুদানের অর্ধেকের ও বেশি ঔষধ প্রস্তুত করত।কিছু সম্ভব করার ক্ষমতা রাখেন।

যথার্থই আমি এই দুটি ঘটনার মাঝে শুধুমাত্র একটি পার্থক্যই দেখতে পাচ্ছি, তাহলো এই যে সুদানের ফ্যাক্টরিটি নির্মাণ ও পরিচালনা করতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছিল তা ছিল মুসলিমদের আর সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত ফ্যাক্টরিতে অবস্থানরত ও নিহত কর্মীরা ছিল মুসলিম।

আর ঐ হাইজ্যাকাররা যে ভবন দুটি ধ্বংস করেছিল সেগুলো তৈরি করতে কুফফারদের অর্থ ব্যয় হয়েছিল আর যারা মারা গিয়েছে তারাও ছিল কুফফার। সুতরাং এটাই কি একমাত্র পার্থক্য যার জন্য আমাদের ভাইরা আমেরিকায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটিকে সন্ত্রাসবাদ বলছেন কিন্তু সুদানে যা হয়েছিল এ জন্য দুঃখ বোধ করছেন না, এমনকি এ ঘটনাটিকে সন্ত্রাসবাদ ও বলছেন না!!

তাছাড়া, লিবিয়ার জনগণ যে দুর্ভিক্ষের শিকার হল, ইরাকের জনগণ যে দুর্ভিক্ষ ও প্রায় প্রতিদিনই মিসাইল হামলার শিকার হয়েছিল এবং আফগানিস্তানের জনগণ যে অবরোধ ও আক্রমণের শিকার হয়েছিল; এসব ঘটনাগুলোকে আপনারা কি বলবেন? এগুলো কি সন্ত্রাসবাদ নয়?

সুতরাং আমরা পাল্টা প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের জবাব দিতে চাই যে, 'নিরীহ জনগণ' বলতে তারা কি বোঝান?

তাদের জবাব হয়ত নিচের তিন শর্তের যেকোনো একটি হবেঃ

১ম শর্তঃ [মানুষের মাঝে পার্থক্য করার অক্ষমতা]

(তারা বলবেঃ) "তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা নিজ দেশের সাথে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করেনি; সশরীরে বা আর্থিকভাবে বা সমর্থন জানিয়ে বা অন্য কোন পন্থায়- কোনভাবেই না।"

কিন্তু এই শ্রেণীতে তাকে তখনই রাখা সম্ভব যখন তাকে আলাদাভাবে চেনা যাবে না বা সে বাকিদের সাথে সহাবস্থানে থাকবে না।

কিন্তু সে যদি বাকিদের সাথে অবস্থান করে আর তাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার উপায় না থাকে, তখন এ অবস্থায় তাকে হত্যা করা বৈধ আর ঠিক এভাবে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের ও হত্যা করা বৈধ।

ইবন কুদামাহ বলেছেন,

> "আল-বায়াত (রাত্রিকালীন আক্রমণ) এর সময় ও যুদ্ধের পরিখাগুলতে নারী ও শিশুদের হত্যা করা বৈধ, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের পৃথকভাবে সনাক্ত করা যাচ্ছে; আর তাদের হত্যা ও পরাজিত করার জন্য (তাদের নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে) তাদের গবাদি পশুগুলোকেও হত্যা করা বৈধ। আর এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।"
>
> [আল-মুঘনি ওয়াশ-শারহ, ১০ম খণ্ড/৫০৩]

আর তিনি আরও বলেন,

> “শত্রুদের রাতে আক্রমণ করা বৈধ। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল বলেন, ‘রাত্রিকালীন আক্রমণে কোন সমস্যা নেই, আর রোমানদের কি রাত্রিকালীন ছাড়া অন্য কোন সময়ে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল?’ তিনি আরও বলেন, ‘আর আমরা এমন কারও কথা জানি না যিনি এই রাত্রিকালীন আক্রমণকে অবৈধ বলেছেন।’ ”
>
> [আল-মুঘনি ওয়াশ-শারহ, ১০ম খণ্ড/৫০৩]

দ্বিতীয় শর্তঃ [সমর্থক ও সহযোগী]

তারা বলবে, “তারা তাদের যুদ্ধরত দেশের সাথে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করেনি, তারা কেবল আর্থিক ভাবে বা সহায়ক মতামত দিয়ে সাহায্য করেছে।”

কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরা ‘নিরীহ’ বলে সাব্যস্ত হবে না, বরং তারা ‘রিদা’ অর্থাৎ সমর্থক ও সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত যোদ্ধা হিসেবে গণ্য হবে।

ইবন ‘আব্দুল-বার (আল্লাহ্ তার উপর সন্তুষ্ট হোন), আল-ইস্তিথকার এ বলেছেন,

> “নারী ও বৃদ্ধদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করছে তাদের হত্যা করার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম কোন মতপার্থক্য করেননি। আর সেই সাথে যেসব শিশু যুদ্ধ করতে সক্ষম আর যুদ্ধ করছে, তাদেরও হত্যা করতে হবে।” [আল-ইস্তিথকার, ১৪তম খণ্ড/৭৪]

আর ইবন কুদামাহ (আল্লাহ্ তাকে রহম করুন) এ সংক্রান্ত ইজমা টি বর্ণনা করেছেন, যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা হবে যদি তারা যুদ্ধে সহায়তা করে।

আর ইবন আব্দুল-বার (আল্লাহ্ তাকে রহম করুন) বলেন,

> “তারা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুরাইদ ইবন আস-সুম্মা কে হুনায়ুনের দিনে হত্যা করেছিলেন কারণ সে ছিল যুদ্ধের একজন পরামর্শদাতা ও কৌশল নির্ধারক। সুতরাং বৃদ্ধদের মধ্যে এমন যে কেউই থাক না কেন, সকলের মতে তাকে হত্যা করা হবে।”
>
> [আত-তামহিদ, ১৬তম খণ্ড/১৪২]

আর ইমাম আন-নববী (আল্লাহ্ তাকে রহম করুন) সহীহ মুসলিমের ব্যখ্যাগ্রন্থের ‘কিতাবুল জিহাদ’ অধ্যায়ে এ বিষয়ের ইজমা তুলে ধরেছেন যে, কোন বৃদ্ধ যদি মতামত দিয়ে কুফফারদের যুদ্ধে সহায়তা করে তাহলে তাকে হত্যা কর বৈধ।

আর ইবন কাসিম (আল্লাহ্ তাকে রহম করুন) আল-হাশিয়াহ তে বলেছেন,

> "তারা এ বিষয়ে একমত যে সহায়তাকারী ব্যক্তি আর একজন যোদ্ধার ব্যাপারে রায় একই হবে।"

আর ইবন তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ্ তাকে রহম করুন) এই ইজমা উল্লেখ করেছেন আর সেই সাথে নিজের মতামত ও দিয়েছেন যে,

> "যারা আত তইফা আল-মুমতানি'আহ (যে দলের লোকজন অবশ্য পালনীয় কর্তব্য থেকে বিরত থাকে) এর সাহায্যকারী ও সমর্থক তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ তারা যে ফল ভোগ করে ও যে কর্ম সম্পাদন করে তাতে তারা অংশীদার।"

তৃতীয় শর্তঃ [তাদের মাঝে বিদ্যমান মুসলিমরা]

তারা বলবে, "সেখানে মুসলিমরাও অবস্থান করছিল।" এই মুসলিমদের ততক্ষণ মারা যাবে না যতক্ষণ তারা পৃথক অবস্থানে থাকবে। আর যদি তারা কুফফারদের সাথে সহাবস্থানে থাকে আর এ কারণে তাদেরকে এড়িয়ে আক্রমণ করা সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় তাদের হত্যা করা বৈধ। আর এ বিষয়টির ব্যাপারে উপরে মানব ঢাল সংক্রান্ত আলোচনায় ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে।

আর কিছু ব্যক্তি বারবার একই কথা আওড়ান, 'নিরীহ জনগণ' এর পক্ষ নিতে গিয়ে; এমনকি যখন তারা এসকল 'নিরীহ জনগণ' দের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এক্ষেত্রে বলতে হয় যে এসব পশ্চিমা পরিভাষার এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ারই কুপ্রভাব, এছাড়া আর কিছুই নয়।

আর এই কুপ্রভাব এতটাই মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে যাদের থেকে আশা করা হয়নি, তারাও পর্যন্ত এসব পরিভাষা ব্যবহার করছে, যা কিনা শরয়ী পরিভাষার সাথে সাংঘর্ষিক।

কাফিররা আমাদের সাথে যা করেছে তাদের সাথেও তা করা আমাদের জন্য বৈধ- আর এই জ্ঞানের আলোকে আমরা তাদের যুক্তি খণ্ডন করছি ও সঠিক বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, যারা 'নিরীহ জনগণ' শব্দটি বারবার ব্যবহার করছেন। মহান আল্লাহ্ তা' আলা আমাদের এই কাজের অনুমতি দিয়েছেন। আর এর প্রমাণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করছি তাঁর বাণীঃ

> *"আর যদি তোমরা শাস্তি দাও (তোমাদের শত্রুদের, তাহলে তাওহিদে বিশ্বাসীরা শুনে রাখ), তাদের সেভাবেই শাস্তি দাও, যেভাবে তোমরা নিপীড়িত হয়েছ।"*
>
> *[সুরা আন নাহল, ১২৬]*

আরর তিনি আরও বলেন,

> *“আর তাদের উপর যখন জুলুম করা হয়, তারা প্রতিশোধ নেয়। মন্দের বদলা হল অনুরূপ মন্দ।” [সুরা আস শুরা, ৩৯-৪০]*

আর জ্ঞানী আলেম উলামাদের মধ্যে যারা উত্তম প্রতিশোধের বৈধতার ব্যাপারে বলেছেন তারা হলেনঃ

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহঃ বলেছেন,

> “নিশ্চয়ই, উত্তম প্রতিশোধ নেওয়া তাদের অধিকার। তাদের জন্যে মনোবল পুনরোদ্ধার ও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসব বৈধ, তারপরও তারা চাইলে প্রতিশোধ গ্রহণ নাও করতে পারে যখন সবর করাই উত্তম।
>
> কিন্তু এটা কেবল তখনই করা উচিৎ, যখন এ প্রতিশোধ জিহাদের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখবে না বা তাদের (শত্রুদের) অন্তরে ভয় বৃদ্ধি করবে না (যাতে করে তারা বিরত থাকে) বা এমনই কিছু।
>
> কিন্তু একটি বড়সড় উত্তম প্রতিশোধ যদি তাদেরকে ঈমানের দিকে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যম হয় বা এতে করে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়, তাহলে এক্ষেত্রে, এই প্রতিশোধ হুদুদ (বৈধ শরয়ী শাস্তি) ও একটি (উপযুক্ত) শরীয়াহ-ভিত্তিক জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে।”
>
> [ইবন মুফলিহ কর্তৃক বর্ণিত, ৬ষ্ঠ খণ্ড/২১৮]

আর এর মাধ্যমে একটা বিষয় স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে,

যারা ‘নিরীহ জনগণদের হত্যা’ ইস্যুটি কোন সীমাবদ্ধতা বা নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই বারবার উল্লেখ করছেন, তারা মূলত রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর সাহাবী ও তাদের উত্তরসূরিদেরই দোষারোপ করছেন, তাদের ভাষ্যমতে ‘নিরীহ জনগণের হত্যাকারী’ হিসেবে।

কারণ আল্লাহর রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আত-তায়িফের যুদ্ধে কামান ব্যবহার করেছিলেন, আর কামানের বৈশিষ্ট্য হল এই যে যখন সে গোলা নিক্ষেপ করে তখন সে পার্থক্য করে না (দোষী ও নির্দোষ ব্যক্তিদের মাঝে)।

আর রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনু কুরাইজাহর ইহুদীদের মধ্যে যারা বয়: সন্ধিকালে পৌঁছেছিল তাদের সবাইকে হত্যা করেছিলেন।

“কুরাইজাহর দিন যে কেউই বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছেছিল, আকে হত্যা করা হয়েছিল।” এই হাদিসটির ব্যাখ্যায় ইবন হাযাম আল-মুহাল্লা তে বলেছেন,

> “এটাই ছিল সাধারণ ব্যাপার যে রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মধ্যে অত্যাচারী শাসক বা কৃষক বা ব্যবসায়ী বা বৃদ্ধ- একজনকেও জীবিত ছাড়েননি আর এটি হল তাঁর পক্ষ থেকে একটি প্রতিষ্ঠিত ইজমা।”[আল মুহাল্লা, ৭ম খণ্ড/২৯৯]

ইমাম ইবন আল কায়্যিম (আল্লাহ্ তাকে রহম করুন) যাদ-আল-মা’আদ এ বলেন,

> “এটা ছিল রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিক নির্দেশনা যে যদি কোন গোষ্ঠীর লোকজনের সাথে তাঁর চুক্তি থাকে, আর তারা বা তাদের কিছুসংখ্যক ব্যক্তি চুক্তি ভঙ্গ করে ও বাকিরা এতে সমর্থন জানায় ও খুশী হয়, তাহলে তিনি তাদের সবার সাথেই যুদ্ধ করবেন আর তাদের সবাইকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য করবেন যেমনটা তিনি বনু কুরাইজাহ, বনু আন নাছর, বনু কাইনুকা ও মক্কাবাসীর সাথে করেছিলেন।
>
> সুতরাং যারা চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ ছিল এটাই।”

আর তিনি আরও বলেন,

> “ইবন তাইমিয়্যা পূর্বের খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধের ফতওয়া দিয়েছেন যখন তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের শত্রুদের সাহায্য করেছিল, অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সহায়তা করার মাধ্যমে।
>
> আর যদিও তারা আমাদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করেনি বা যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, তিনি দেখেছিলেন যে খ্রিস্টানরা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল যেমন করে কুরাইশরা রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে যখন তারা বনু বকর ইবন ওয়া’ ইল কে সেসব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেছিল যাদেরকে মুসলিমরা চুক্তির অধিকার অনুযায়ী নিরাপত্তা দিচ্ছিল।”

উপসংহারঃ

উপসংহারে বলতে চাই, আমরা জানি যে কুফফার পশ্চিমারা – এবং বিশেষ করে আমেরিকা- আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও চেচনিয়ার বিরুদ্ধে তাদের কর্মকাণ্ডগুলো নতুন করে সক্রিয় করার জন্য এসব ঘটনাবলীকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবে, প্রকৃত অপরাধী কারা তার পরওয়া না করেই। আরা তারা চেষ্টা করবে জিহাদকে ও মুজাহিদদের সমূলে ধ্বংস করার, কিন্তু তারা কখনই তা করতে পারবে না।

তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে তাদের উপর আক্রমণ করবে, আফগানিস্তানে আমাদের তালিবানের ইসলামী ইমারাত এর মুসলিম ভাইদের দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এই ইসলামী ইমারাত মুজাহিদদের নিরাপত্তা দিয়েছে, সাহায্য করেছে, তাদের বিজয়ী করেছে যখন অন্য সবাই তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; তারা পশ্চিমাদের সামনে মাথা নত করেনি।

আর একারণে, এই মুজাহিদ রাষ্ট্রটিকে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

মহান আল্লাহ্ তা' আলা বলেন,

> *"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের আওলিয়া (সাহায্যকারী, সমর্থক, বন্ধু, অভিভাবক)।" [আত তাওবাহ, ৭১]*

তিনি আরও বলেন,

> *"আল বির ও আত তাকওয়ায় (সৎকর্ম, নিষ্ঠা ও আনুগত্যে) তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর…" [আল মায়িদাহ, ২]*

আর তাদের জান ও মাল দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, প্রচার প্রসারের মাধ্যমে, ও সহায়ক মতামত দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করা, আর তাদের ইজ্জত-আব্রু ও সম্মান রক্ষা করা, আর তাদের বিজয়ের জন্য, সাহায্যের জন্য ও অটল থাকার জন্য দুআ করা আমাদের কর্তব্য।

আর যেমনটা আমরা বলেছি যে প্রতিটি মুসলিমের জন্য তালিবানের ইসলামী ইমারাতকে সাহায্য সহযোগিতা করা ফরজ, ঠিক সেভাবে প্রতিবেশী ও নিকটবর্তী মুসলিম দেশগুলোর জন্যও এই ইসলামী ইমারাতকে পশ্চিমা কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করা ফরজ।

আর তাদের বুঝা উচিৎ যে, এই ইসলামী ইমারাতের বিরুদ্ধে লড়াই শুধুমাত্র দ্বীন ইসলামের কারণেই করা হচ্ছে, তাই তাদেরকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া আর কুফফারদের বিজয়ী করা মূলত কুফফারদের আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করারই নামান্তর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> *"হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।" [আল-মায়িদাহ, ৫১]*

তিনি আরও বলেন,

> *"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে (কাফির, মুশরিক ইত্যাদি) বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না…." [আল মুমতাহিনা, ১]*

মহান আল্লাহ্ তা' আলা আরও বলেন,

> *"ইবরাহিম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি;*
>
> *এবং উদ্রেক হল আমাদের- তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।" [আল মুমতাহিনা, ৪]*

তিনি আরও বলেন,

> *"তুমি পাবে না এমন জাতিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, বন্ধুত্ব করতে তার সাথে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়।" [আল মুজাদিলাহ, ২২]*

মহান আল্লাহ্ বলেন,

> *"আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, 'তোমরা যেগুলোর ইবাদাত কর, নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত। তবে (তিনি ছাড়া) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি আমাকে শীঘ্রই হিদায়াত দিবেন।" [আজ-জুখরুফ, ২৬-২৭]*

ইতিহাস ও মানবজাতি কোনদিন এসব কুফফার জাতির পরাজয় ভুলবে না আর এসব দেশের ও তাদের জনগণের জন্য এটি এক অপমানজনক পরাজয় হবে, আর এই অপমানের কালিমা ইতিহাস ব্যাপী তাদের উপর লেগে থাকবে।

আর প্রতিবেশি দেশগুলোর সাবধান থাকা উচিৎ তাদের ভাইদের হতাশ করার ব্যাপারে, তাদের কখনই উচিৎ নয় তাদের শত্রুদের তাদের উপর জয়লাভ করতে সাহায্য করা আর তাদের উচিৎ আল্লাহর আযাব, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করা।

রাসূল ﷺ বলেন,

> “এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে না তাকে ত্যাগ করে, না তাকে পরাজিত করে।” [সহীহ মুসলিমে বর্ণিত]

আর মহান আল্লাহ্ তা'আলা হাদিসে কুদসীতে বলেন, *“যে কেউই আমার আউলিয়ার সাথে শত্রুতা করে, তাহলে আমি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।”* [সহীহ আল-বুখারী তে বর্ণিত]

তিনি বলেন,

> “যে কেউ এক মুমিন বান্দাকে অপদস্থ অবস্থায় পায় কিন্তু সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাকে সাহায্য করে না, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা' আলা তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করবেন।”

[পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি]

আর পাকিস্তানকে আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই, ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু আমেরিকার কাছে এর আত্মসমর্পণ আর আমেরিকাকে নিজেদের আকাশপথ ও ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হল বিবেক ও বিচার-বুদ্ধি বিবর্জিত কাজ, কূটনৈতিক বা রাজনৈতিক কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচক কাজ নয়।

কারণ এতে করে আমেরিকাকে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীণ গোপনীয় বিষয়গুলো তদন্ত করার এবং এখানকার পারমাণবিক চুল্লিগুলো উন্মুক্ত করার, যে চুল্লিগুলো পশ্চিমাদের আতঙ্ক। ফলে আমেরিকানরা এগুলোতে ইহুদি আক্রমণের সুযোগ করে দিচ্ছে যেমনটা পূর্বে ইরাকি পারমাণবিক চুল্লির সাথে করা হয়েছিল।

আর কিভাবে পাকিস্তান নিজেদের সেই শত্রু থেকে নিরাপদ মনে করছে যারা তাদের জন্য বিগত দিনে হুমকিস্বরূপ ছিল। আর আমি বিশ্বাস করি যে পাকিস্তানের সাধারণ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন লোক, এমনকি ঈমানদার লোকদের কথা তো বলাই বাহুল্য, তারা কখনও এটা মেনে নেবে না আর কখনও তাদের বিগত দিনের শত্রুর জন্য রাস্তা সহজ করে দেবে না।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেন, তাঁর কালিমাকে সমুন্নত করেন আর ইসলামকে, মুসলিমদেরকে ও মুজাহিদদেরকে শক্তিশালী করেন, আর যেন আমেরিকা ও তার অনুসারীদের এবং তাদের সাহায্যকারীদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর উপর একক ক্ষমতাবান, এসব করতে তিনি অবশ্যই সক্ষম।

আর আল্লাহ্ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীদের সকলের উপর তাঁর রহমত নাজিল করেন।

২৮/০৬/১৪২২ হিজরি।

আল্লামা হামুদ বিন উক্বলা আশ-শুয়াইবি রহঃ'র পরিচয়

তিনি হলেন বানু খালিদ গোত্রের আবু আব্দুল্লাহ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ বিন উক্বলা বিন মুহাম্মাদ বিন আলি বিন উক্বলা আশ-শু' আইবি আল-খালিদি। তার জন্ম হয় ১৩৪৬ হিজরিতে (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ)। ক্বাসীম প্রদেশের বুরাইদা বিভাগের আশ-শাক্কাহ শহরে। তারায় পড়াশুনায় হাতেখড়ি হয় ৬ বছর বয়সে। ১৩৫২ হিজরিতে (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) গুটিবসন্তের কারনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান।

তবে অন্ধত্ব তার 'ইলম অর্জনের পথে বাধা হতে পারে নি। তিনি শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক আল-উমারির অধীনের ক্বুরআনের হিফয করা শুরু করেন এবং ১৩ বছর বয়সে সম্পূর্ণ ক্বুরআনের হিফয সমাপ্ত করেন।

তবে হিফয ও তাজউয়িদ সম্পূর্নভাবে আত্মস্থ করতে তার সময় লাগে আরো ২ বছর। তার এই অর্জনের পেছনে তার পিতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল, তিনি সবসময় চাইতেন যে তার ছেলে একজন 'ইলম অন্বেষণকারী হবে - আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

ক্বুরআন হিফয করার পর তিনি কিছদিন তার পিতাকে চাষাবাদ ও খেজুর বাগানের দেখাশুনায় সাহায্য করেন।

১৩৬৭ হিজরিতে (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ) পিতার নির্দেশ অনুযায়ী 'ইলম অর্জনের লক্ষ্যে তিনি রিয়াদে আসেন। তিনি ;ইলম শিক্ষা শুরু করেন শায়খ আব্দুল লতিফ বিন ইব্রাহিম আল আশ-শাইখ রাহিমাহুল্লাহর অধীনে। এই মহান শিক্ষকের অধীনের তিনি আল-আজ্রুমিয়্যাহ, উসুল আস-সালাসা, রাহবিয়াতু ফিল ফারাইদ এবং ক্বাওয়াইদ আল-আরবা' আ সম্পূর্ণ মুখস্থ ও এর ব্যাখ্যাসমূহ আত্মস্থ করা সম্পন্ন করেন।

অতঃপর১৩৬৮ হিজরিতে (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) তিনি শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম আল-আশ শায়খ রাহিমাহুল্লাহর শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। এই মহান শায়খের অধীনে তিনি প্রাথমিক ভাবে যাদ আল মুস্তাক্বানি, কিতাবুত তাওহিদ, কাশফুশ শুবুহাত, আল ওয়াসিতিয়্যাহ (শায়খ আল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ), আল-আরবা' ঈন আন-নাওয়াউইয়্যাহ, আলফিয়াতু ইবন মালিক, বুলুগুল মারাম অধ্যায়ন। শায়খ মুহাম্মাদের রাহিমাহুল্লাহ অধিনে সকল ছাত্রকেই বাধ্যতামূলকভাবে এই কিতাবগুলো শিখতে হতো।

এগুলোর পর তিনি শায়খ মুহাম্মাদের কাছে অধ্যায়ন করেন আক্বিদা আত-তাহাউইয়্যাহ, আদ দুররাহ আল মুদানিয়্যাহ, আক্বিদা আল-হামাউইয়্যাহ। শায়খ মুহাম্মাদ আলাদা ভাবে তাকে এই কিতাবগুলোর শিক্ষাদান করেন।

এছাড়াও তিনি শিক্ষাগ্রহন করেন নিম্নোক্ত উলামার অধীনে –

তিনি আব্দুল আযিয বিন বাযের রাহিমাহুল্লাহ অধীনে তাওহিদ ও হাদিসের 'ইলম অর্জন করেন।

শায়খ মুহাম্মাদ আল আমিন আশ-শানক্বিতি রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ মুহাদ্দিস আব্দুর রাহমান আল-আফ্রিকি রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ আব্দুল আযিয বিন রাশীদের রাহিমাহুল্লাহ অধীনে তিনি ফিক্বহ অধ্যায়ন করেন, শায়খ আব্দুল্লাহ আল খুলাইফি, শায়খ হামাদ আল-জাসির, শায়খ সাউদ বিন রাশুদ (রিয়াদের ক্বাযি), শায়খ ইব্রাহিম বিন সুলাইমান।

এছাড়াও ইউসুফ উমার হাসনাইন, আব্দুল লতিফ সারহান, ইউসুফ দাবা' সহ মিশরের বিভিন্ন আলিমের কাছে আরবী ব্যকরন শিক্ষা করেন

১৩৭৬ হিজরিতে (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ) তিনি কিং সাউদ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩৭৭-১৪০৭ হিজরি পর্যন্ত (১৯৫৬-১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ) তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

তারপর তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। এই দীর্ঘ সময় তিনি ইউনিভার্সিটিতে তাওহিদ, ফিক্বহ, ফারাইদ, হাদিস, উসুল, ব্যাকরনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষাদান করেন। এছাড়া তিনি বেশ কিছু মাস্টার্স ও ডক্টরেট থিসিসের সুপারভাইজার ছিলেন।

তার অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম হলঃ

আব্দুল আযিয আল-আশ শায়খ (সৌদি আরবের বর্তমান মুফতি), আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কি প্রাক্তন ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রী,আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম আল আশ-শায়খ প্রাক্তন বিচার সংক্রান্ত মন্ত্রী, সালিহ আল-ফাউযান, গায়হাব আল গায়হাব, ক্বাজি আব্দুর রাহমান বিন সালিহ আল-জাবর, ক্বাজি আব্দুর রাহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন আল-আজলান – প্রাক্তন প্রধান ক্বাজি ক্বাসিম প্রদেশ, সুলাইমান বিন মুহান্না – প্রাক্তন প্রধান ক্বাজি রিয়াদ, আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান

এছাড়া শায়খ যাদের ডক্টরেট থিসিস রিরিভিউ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন-

আবু বাকর আল জাযাইরি, রাবি বিন হাদি আল-মাদ্বখালি, মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন।

শায়খের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছাত্র যারা তার আদর্শ ও মানহাজকে অবিকৃত ভাবে ধারন করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – শায়খ সুলাইমান বিন নাসির আল-‘উলওয়ান, শায়খ আলি আল খুদাইর, শায়খ নাসির আল ফাহাদ।

যখন আফগানিস্তানে তালিবান কর্তৃক ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শায়খ হামুদ এবং তার দুই ছাত্র সুলাইমান আল-‘উলওয়ান এবং আলি আল-খুদাইর, মুল্লাহ উমার কে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখেন এবং মুল্লাহ উমারকে আমিরুল মু’ মিনিন বলে সম্বোধন করেন।

এছাড়া সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য তালিবানকে সাহায্য করা বাধ্যতামূলক বলে তিনি একটি ফতোয়া দেন। এছাড়া ২০০১ এ যখন সারা বিশ্ব মুসলিমদের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার সাথে জোট বাধছিল তখন এই মহান নির্ভীক শায়খ ফতোয়া দেন যে আগ্রাসী কাফির অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে তালিবানকে এবং আফগানিস্তানের মুহাজিরদের সহায়তা করা সকল মুসলিম উম্মাহর জন্য বাধ্যতামূলক।

শায়খ হামুদ প্রকাশ্যে সৌদি শাসকগোষ্ঠীর কুফর সম্পর্কে কথা বলতেন। এই কারনে ৭৫ বছর বয়সে এই অন্ধ বৃদ্ধকে কারারুদ্ধ করা হয়।

শায়খ হামুদ বিন উক্বলা আশ-শুয়াইবি আপোষহীন, নির্ভীক এক নক্ষত্র, মিল্লাতু ইব্রাহিমের দিকে আহবানকারী, মুশরিক ও কাফিরদের উপেক্ষা করে প্রকাশ্যে সত্যকে ঘোষণাকারী - যিনি শায়খ আল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ও উলামায়ে নাজদের প্রকৃত উত্তরসূরি।

এই মহান শিক্ষক ১৪২২ হিজরির ৪ই জিলক্বদ (১৮ই জানুয়ারি, ২০০২) মৃত্যুবরন করেন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

হে আল্লাহ আপনি শায়খ হামুদ বিন উক্বলা আশ-শুয়াইবিকে ক্ষমা করে দিন, এবং আপনার রহমতের চাঁদরে তাঁকে মুড়িয়ে দিন, তার কবরকে আলোকিত ও প্রশস্ত করে দিন।

তার কবরকে জান্নাতের বাগানগুলোর মধ্যে একটি বাগান বানিয়ে দিন, তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন, তাকে বিচার দিবসে মহা আতঙ্ক থেকে রক্ষা করুন…আমীন।